IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ভারতের পরিবেশ আন্দোলনে নারীর ভূমিকার সেকাল ও একাল

পুলক কুমার দাস

Recearch Scholar, OPJS University, Rajasthan;
State Aided Collage Teacher I
Kalinagar Mahavidyalaya
North 24 Parganas, West Bengal

সারাংশ (Abstract) : পরিবেশ হলো জীবন ব্যবস্থার উৎস। নারী ও পরিবেশ অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ। নারীর জীবন-জীবিকার সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নারীই সবসময় সোচ্চার হয়েছে প্রকৃতির সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষায়। নারীর সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতির গভীর, নিবিড় সম্পর্ক, যা সৃষ্টির আদি থেকে স্বীকৃত। বিশ্ব ব্যাংকের ১৯৯১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মাটি জলসহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীরা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছেন। বন, শক্তি, চারপাশের প্রাকৃতিক বিশ্ব বা পরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের অতীত এবং বর্তমান জ্ঞান রয়েছে। পৃথিবীর সবদেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ ও অনুন্নত দেশের নারীকে তাঁর প্রতিদিনের কাজের জন্য পরিবেশ ও প্রকৃতি-নির্ভর হতে হয়, প্রতিদিন তাঁদের যেতে হয় প্রকৃতির কাছে। তাঁরা তাঁদের বেশিরভাগ সময় বন, জলাভূমি, খামার রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য, জ্বালানি কাঠ, জল এবং গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যয় করেন। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রায় ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ খাদ্য এককভাবে মহিলাদের দ্বারা উৎপাদিত হয়। এই কারণে প্রকৃতির বিপর্যয়ে পুরুষের তুলনায় নারীই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই, এই বিপন্নতাকে প্রতিহত করার জন্য নারীই সবার আগে প্রতিবাদ করেন; প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা নিজেদের জীবনকে সঁপে দিয়েছেন এবং তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কান্ডারী। ভারতে পরিবেশ সুরক্ষায় গড়ে ওঠা চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইলেন্ড ভ্যালি আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনে নারীরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে ছিলেন। মেধা পাটেকার, কিংকরি দেবী, বন্দনা শিবা প্রমূখ নারীদের পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনে তাঁদের অসাধারণ নেতৃত্ব নারীর সৃজনশীল ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নারী নেতৃত্ব অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা আন্দোলন থেকে পিছপা হননি। বীর বিক্রমে তাঁরা লড়াই চালিয়ে গেছেন। পরিবেশ রক্ষায় নারীর ভূমিকা তাঁদের কর্মযজ্ঞের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে। এই গবেষণা প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, সেকাল ও একাল অর্থাৎ সকল সময়ে পরিবেশবাদী আন্দোলনে নারীর নেতৃত্ব ও যোগদান গভীরভাবে আন্তরিক এবং পরিবেশের সঙ্গে নারীর যেন নাড়ীর গভীর যোগ রয়েছে।

মূলশব্দ **(keywords) :** পরিবেশ, প্রকৃতি, নারী, প্রতিবাদ, পরিবেশ সুরক্ষা, উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন।

ভূমিকা **(Introduction) :** পরিবেশ কথাটির ইংরাজী অর্থ Environment, যা এসেছে ফরাসী শব্দ 'এনভাইরনার' (environner) থেকে, যার অর্থ হল পারিপার্শ্ব। সুতরাং , পরিবেশ বলতে চারপাশের অবস্থাকে বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট স্থানের সমস্ত জৈব ও প্রাকৃতিক জড় উপাদানের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ যুক্ত হয়ে যে সামগ্রিক অবস্থা তৈরী হয়, তাকে পরিবেশ বলে। ইউনাইটেড নেশন্স এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP, 1976) অনুযায়ী- "পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীয় প্রণালীকে বোঝায়, যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে"। পরিবেশ বিজ্ঞানী বটূকিন ও কেলার-এর মতে, "জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) তাদের জীবনচক্রের যে কোনো সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।"সহজ কথায় পরিবেশ অর্থাৎ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবজ পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ-এই তিনের সমষ্টি। প্রকৃতির সমস্ত দান মিলে মিশে একসঙ্গে তৈরি হয়েছে পরিবেশ। পাহাড়, নদী, বন, জঙ্গল, কীট, পতঙ্গ, জল, মাটি, জীবজন্তু, মানুষ সবাইকে নিয়ে পৃথিবীর এই পরিবেশ গড়ে উঠতে সময় লেগেছে প্রায় ৫০০ কোটি বছর। মানুষ এসেছে আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। তার ফল হয়েছে কিছু ভালো, কিছু মন্দ। এই মন্দ প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার সার্বিক সচেতনতা, বিশেষ করে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা।

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্ব জুড়েই ১৯৭০ এর গোড়া থেকে মানুষের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদের বহুল ব্যবহার ও তার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর তার নঞর্থক প্রভাব ক্রমশ লক্ষিত হতে থাকে । এ বিষয়ে প্রথম সাড়া জাগায় ১৯৬২ সালে প্রকাশিত মার্কিন জীববিজ্ঞানী Rachel Carson লিখিত গ্রন্থ 'Silent Spring'। আঙ্গুর ক্ষেতগুলিতে অধিক ফলনের জন্য কীভাবে নির্বিচারে DDT নামে এক কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, জমির উর্বরতা, বাস্তুতন্ত্রর ও মানুষের স্বাস্থ্য, তার বিশদ ব্যাখ্যা তিনি তুলে ধরেন এই গ্রন্থে। ঐ একই বছরে (১৯৬২) গঠিত হয় 'Club of Rome' ও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য পরিবেশবাদী সংঘ ও প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০-এর দশকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় পরিবেশগত সচেতনতা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘঠিত হতে থাকে বিভিন্ন পরিবেশগত আন্দোলন। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ অবনমন ও পরিবেশ দূষণ রোধের প্রয়াসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম শহরে জাতিপুঞ্জ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্ব বসুন্ধরা সম্মেলন - 'The Stockholm Conference on Environment and Development'। এই ধারা অনুসরণ করে পরবর্তী দশকগুলিতেও হয়েছে একাধিক শীর্ষ সম্মেলন যেমন, ১৯৯২ সালের রিও বসুন্ধরা সম্মেলন, ২০০২ সালের জোহানেসবার্গ সম্মেলন ইত্যাদি ।

ভারতেও গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে শুরু হয় একাধিক পরিবেশ আন্দোলন। ১৯৬০-এর শেষভাগ থেকেই আমাদের দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর তথাকথিত 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে।প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ডেকে আনে পরিবেশ অবনমন ও দূষনের সমস্যা। এর বিরুদ্ধেই দানা বাঁধতে থাকে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা ও পরিবেশ আন্দোলন। ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবেশের অবনমন ও দূষণ রোধ করা, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সুসামঞ্জস্য স্থাপন, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন গড়ে তোলা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় পরিবেশগত নানা সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতে একাধিক পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তবে, পরিবেশগত সমস্যা কিন্তু স্থান পায়নি রাজনীতির মূলস্রোতে থাকা রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচীতে। পরিবেশ কখনোই তাদের আন্দোলনের বিষয় হয়ে ওঠেনি। পরিবেশের দ্রুত অবনমনের ফলে মানুষ হারাচ্ছিল তাদের পরিবেশের অধিকার' (Right to Environment)। এই অধিকার সুরক্ষিত করতে শুরু হয় প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন। তবে, তা রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংগঠন প্রভৃতির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে পরিবেশ আন্দোলন শুরু হয় ও বিস্তার লাভ করতে থাকে 'অ-দলীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া (non-party political process) হিসাবে ।

ভারতে পরিবেশ আন্দোলন তুলে ধরেছে বিভিন্ন বিষয়কে, যেগুলি সবই কোনও না কোনও ভাবে মানুষের পরিবেশের অধিকার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছু আন্দোলন চেষ্টা করে প্রাকৃতিক সম্পদকে জল, জমি, বনাঞ্চল, শস্য বীজ যথেচ্ছ ব্যবহার-এর গ্রাস থেকে রক্ষা করতে। কোনও আন্দোলন প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ-এর আন্দোলন - যেমন, বড় বাঁধ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, খনিজ সম্পদ ও সমুদ্র সম্পদের নির্বিচার শোষণ - এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কারণ, এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় ও

হারায় তাদের জীবন ও জীবিকা। আবার, কিছু আন্দোলনের লক্ষ্য হল 'উন্নয়ন'-এর নানা কুফল যেমন, পরিবেশ দূষণ, সামাজিক ব্যাধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আমাদের দেশে এই নানাবিধ পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হয়ে থাকে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও গোষ্ঠীর উদ্যোগে। এক্ষেত্রে নারীগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের প্রতিবাদী এবং প্রতিরোধ ধর্মীয় পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনের কারণে ভারতের সংবিধানের ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধনী আইন প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতির বিষয়টিকে মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (Explanation and Analysis) :

এ পর্যন্ত ভারতে সংঘটিত পরিবেশ আন্দোলনগুলিকে পরিবেশবাদীরা ও সমাজতাত্ত্বিকেরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বিশিষ্ট তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা ও জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায় (১৯৮৯) তাঁদের লেখা 'Ecolgy and the politics of survivel conflicts over Natural Resources in India' নামক গ্রন্থে বলেছেন, স্বাধীন ভারতে পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে মূলত বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে বিনষ্ট করার প্রতিবাদ হিসাবে। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমাজে ক্ষমতাহীন প্রান্তিক ও দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের জীবন ধারণ ও জীবিকার ওপরে আঘাত হেনেছে। সমাজবিজ্ঞানী হর্ষ শেঠী (১৯৯৩) তাঁর "Survival and Democracy Ecological Struggles in India" শীর্ষক রচনায় প্রতিবাদের বিষয়ের দিক থেকে পরিবেশ আন্দোলনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন- (১) অরণ্যাঞ্চল ভিত্তিক আন্দোলন। এই ধরনের আন্দোলনের বিষয় হল অরণ্যনীতি, বনসম্পদ সমূহের ব্যবহার ইত্যাদি। (২) ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত আন্দোলন। শিল্পায়নের ফলে আবাদী জমির আয়তন হ্রাস, খনিজসম্পদ সমূহের নির্বিচার শোষণ, রাসায়নিক উপকরণ সমূহের নির্বিচারে জনপ্রিয়করণ, যার অনিবার্য পরিনাম হল ভূমি ক্ষয় জল জমা ইত্যাদি। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। (৩) বৃহৎ জলাধার বিরোধী আন্দোলন-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সাধারণ জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য উপজাতি শ্রেণীভুক্ত মানুষকে বাস্তুহারা করা, বনাঞ্চল ধ্বংস করা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিরোধী আন্দোলন। (৪) দূষণবিরোধী আন্দোলন - মূলত শিল্পকারখানা সৃষ্ট দূষনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। (৫) সমুদ্র সম্পদ বা জলসম্পদ সমূহের নির্বিকার শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

বিশনোই আন্দোলন (Bishnoi Movement) :

বিশনোই হলো পশ্চিম রাজস্থানের থর মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে বসবাসরত বৈষ্ণবগোত্রীয় একদল মানুষ, যারা বহু শতাব্দী ধরে পরিবেশ রক্ষার্থে নিজেদের জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলকে সংরক্ষণ করে চলেছে। এই ধর্মের মৌলিক দর্শনটি হল - সমস্ত জীবন্ত বস্তুগুলি জীবের সমান অধিকার। এই প্রকৃতি প্রেমী মানুষদের কাছে পরিবেশ সুরক্ষা, বন্য প্রাণী এবং গাছপালা সংরক্ষণ তাদের পবিত্র ঐতিহ্যের একটি অংশ। প্রচলিত আছে, যোধপুরের মহারাজা অভয় সিং একটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং এর জন্য কাঠের প্রয়োজন ছিল। তাই, তিনি পশ্চিম রাজস্থানের খেজারলি গ্রামে স্থানীয় খেছরি গাছকাটার নির্দেশ দেন। সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য তাঁর লোকেরা এই গ্রামের চারপাশে গাছকাটার জন্য পৌঁছায়। অমৃতা দেবী সেটা দেখা মাত্র ছুটে গিয়ে প্রথমে গাছটিকে জড়িয়ে ধরেন এবং একটি কুঠার তাঁর উপর এসে পড়ায় তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি বিশনোইদের উদ্দ্যেশে একটি বিখ্যাত বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'একটি কাটা মাথা, একটি কাটা গাছের তুলনায় সস্তা'। ৮৩টি গ্রামের মানুষেরা গাছকাটা থেকে আটকানোর জন্য ছুটে গিয়েছিলো এবং দিনের শেষে ৩৬৩ জন প্রাণ হারিয়েছিল। এত লোকের মৃত্যুর কারণে রাজা অনুতাপে গ্রামে এসে ব্যক্তিগতভাবে জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং গাছ কাটা বন্ধের নির্দেশ দেন। ১৭৩০ সালের এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। গাছকাটার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ছিল এক কথায় পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলন। এই আন্দোলনে রাজস্থানী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অমৃতা দেবী নামে একজন সাধারণ নারীর নেতৃত্বকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিল।

চিপকো আন্দোলন (Chipko Movement)

চিপকো কথাটি গাড়োয়ালি শব্দ 'Angalwaltha' থেকে এসেছে। যার হিন্দি ও কানাড়া ভাষায় প্রতিশব্দ হল 'আলিঙ্গন করা'। গাছকে জড়িয়ে ধরার মধ্য দিয়ে চিপকো আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা গাছকে রক্ষা করার জন্য চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ঋষিগঙ্গা, পাতাল গঙ্গা, বিরহী, মন্দাকিনী প্রভৃতি নদীর প্রায় ১৬০০০ হেক্টর অববাহিকায় কয়েক হাজার গাছকাটা হয়েছিল। এর ফলে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে অলকানন্দায় প্রবল আকারে বন্যা দেখা দেয়। এই বন্যার ফলে উত্তরপ্রদেশের ৩,৮০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। অনেক গবাদি পশু ও মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল। পাথারিতে ৪৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া, এখানকার বিদেশি সংস্থাগুলি এই অঞ্চলের বনজসম্পদ দখল করতে চেয়েছিল। অথচ এখানকার অধিবাসীরা বনজ সম্পদের ১০% ভোগ করতে পারত না। বাণিজ্যিক কারণে এভাবে এই অঞ্চলে বৃক্ষনিধনের ফলে কৃষির ফলন কমে যাচ্ছিল, মৃত্তিকা ক্ষয় প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

'১৯৭০-এর দশকের শুরুতে গাড়োয়ালি মহিলারা কয়েকটি ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক কাঠ সংগ্রহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে সংঘের সদস্যরা গোপেশ্বরে একত্রিত হয়ে বনবিভাগের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বনবিভাগ এবং ঠিকাদাররা গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও মতবিরোধ এড়িয়ে চলার জন্য গোপেশ্বর গ্রাম থেকে ৬০ কিমি দূরে কেদারনাথের কাছে ফাটারামপুর-এর অরণ্যে গাছকাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে সেই অরণ্যে হাজির হয়ে গাছকে জড়িয়ে ধরে অরণ্য রক্ষা করেছিল। সংঘ সদস্য ও গ্রামবাসীরা স্লোগান দিতে থাকে এবং বলতে থাকে "মাটি আমাদের, জল আমাদের, জঙ্গল আমাদের, আমাদের পূর্বপুরুষেরাই এগুলি রক্ষা করেছেন। আজ আমরা একে বাঁচাব।" ১৯৭৩ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে এই আন্দোলনের কঠোর রূপ ধারণ করে। ১৯৭৪ সালে সরকার কর্তৃক ২০০০ গাছকাটা হলে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং সুন্দরলাল বহুগুণা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নারী-পুরুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। রাতের অন্ধকারে ঠিকাদারের লোকেরা গাছ কাটতে এলে আদিবাসী মায়েরা প্রতিটি গাছকে সন্তানের মতো জড়িয়ে ধরেন এবং সারারাত জেগে ওই গাছগুলো পাহারা দিয়েছিলেন ওই মহিলারা। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরলা বেন, মীরা বেন, সুদেশা দেবী, বাচনি দেবী চন্দ্রিকা প্রসাদ ভট্ট প্রমুখ পরিবেশবিদরা। ২৬শে মার্চ, ১৯৭৪ সালে যখন বৃহৎ আকারে গাছকাটা শুরু হয়েছিল এবং পাহাড়ের লোকেরা এর বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। গৌরা দেবীর নেতৃত্বে মহিলারা তিনদিনের, তিন রাতের জাগরণ করেছিলেন, যা কাঠের মালিকদের তাদের কাজ শুরু করতে বাধা দিতে সফল হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে মহিলারা বড় বড় গাছগুলিকে রাখী বেঁধে সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করে। এরপর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসলে তিনি ১৫ বছর হিমালয় অঞ্চলে গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরবর্তী পাঁচ বছর উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং এক দশকের মধ্যে হিমালয় জুড়ে সবুজের জন্য এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন (Silent Valley Movement):

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন ছিল ভারতের ইতিহাসে এক অন্যতম পরিবেশ আন্দোলন। উত্তর কেরালার পালঘাট জেলার পাহাড়ি অঞ্চল বর্ষণারণ্য আচ্ছাদিত "সাইলেন্ট ভ্যালি'র দুদিকে কেরালার দুই শহর কোঝিকোড় এবং পালঘাট নিয়ে এই উপত্যকার চেহারা অনেকটা ত্রিভুজের মতো। এমন গভীর জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না, তাই এর নাম "সাইলেন্ট ভ্যালি বা নীরব উপত্যকা"। এই উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে চলেছে কুন্তী নদী, যেখানে ১৯৭৩ সালে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন একটা বাঁধ দেওয়ার প্রকল্প ঘোষণা করে। প্রথমে ১২০ মেগাওয়াট ও পরে ২৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালে কেরালার বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন "কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ" (কে. এস. এস. পি) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নে আপত্তি জানায়। সংগঠনটির সমীক্ষা সূত্রে জানা যায়, প্রস্তাবিত জলাধার তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তার প্রতিকূল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হবে সুদূর প্রসারী। প্রস্তাবিত এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে সাইলেন্ট ভ্যালি বৃষ্টি অরণ্যের প্রায় ৮০০ হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হবে। অর্থাৎ মোট বনভূমির প্রায় ১০ শতাংশ এলাকা বাঁধের জলাধার, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর তৈরি করতে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যে ১৯৭৯ সালের মে মাসে কেরল সরকারকে এক নির্দেশ প্রেরণ করেন। এই সময় সেলিম আলির মতো বিশিষ্ট পক্ষীতত্ত্ববিদ এবং মাধব গ্যাডগিলের মতো পরিবেশ বিজ্ঞানী আলোচ্য প্রকল্পের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানান। একজন প্রকৃতি সংরক্ষণবাদী সুগতা কুমারী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিমজ্জন এর কবল থেকে কেরালার সাইলেন্ট ভ্যালি নামে প্রাকৃতিক বন রক্ষার্থে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর কবিতা "মারাথিনুস্তুতি" (Marathinu Stuthi-Ode to a Tree) এ আন্দোলনের প্রতীক ও দি সেইভ সাইলেন্ট ভ্যালি ক্যাম্পেইন সভার উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত পরিবেশবাদীদের অনুরোধ ও জনমতের চাপে কেরল সরকার ১৯৮৩ সালে নীরব উপত্যকায় প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিকে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে। জীব-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ভারতের এই প্রাচীন ক্রান্তীয় বনভূমিকে ১৯৮৪ সালে "জাতীয় উদ্যান" হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

আপ্পিকো আন্দোলন (Appiko Movement)

ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের তালিকায় দক্ষিণ ভারতের আপ্পিকো আন্দোলন (Appiko Movement) এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কর্নাটক রাজ্যের উত্তর কান্নাড়া জেলায় চিপকো আন্দোলনের সমতুল একটি আন্দোলন ঘটেছিল, যা আপ্পিকো আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালে কর্ণাটকের সিরসী অঞ্চলে সলকানী বনাঞ্চলে বৃক্ষচ্ছেদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার কথা শুনে গ্রামের নারী, পুরুষ ও শিশুরা গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছকাটার প্রতিরোধ জানায়। এই প্রতিরোধ ক্রমে আন্দোলনের রূপ নেয়। কারণ, এই এলাকার নারী ও পুরুষ নিজেদের জীবিকার প্রয়োজনে **ও** জীবনধারনের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর ছিল। তাই সলকানী বনভূমি তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করত। কিন্তু নির্বিচারে গাছকাটা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই আশঙ্কা থেকেই তারা প্রতিবাদ জানায় ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন পান্ডুরাও হেগড়ে। বনবিভাগের নির্দেশে গাছকাটা শুরু হলে ফলকানি গ্রামের যুবক ও মহিলারা গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রামগুলি জঙ্গলে মিছিল করে চিপকো ধরণের আন্দোলন শুরু করে। যুবক ও মহিলারা গাছগুলিকে আলিঙ্গন করে ছিল (কন্নড় ভাষায় অ্যাপিকো 'মানে' আলিঙ্গন করা')। বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে সবুজ গাছকাটা বন্ধের দাবি জানান। বনের মধ্যে অ্যাপিকো আন্দোলন আটত্রিশ দিন ধরে চলতে থাকে। সরকার অবশেষে গাছকাটার আদেশ প্রত্যাহার করে। কর্মীরা লগারদের (Loggers) কাছ থেকে শপথও নিয়েছিলেন যে তারা বনের গাছ ধ্বংস করবেন না। যাইহোক, আবার কাটা শুরু হয় এবং ফলস্বরূপ, জনগণ তাদের অ্যাপিকো আন্দোলনকে ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে পুনর্নবীকরণ করে। এভাবে, আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বটি হুসরির পর্ণমোচী বনে সংঘটিত হয়, যেখানে প্রায় একশ কর্মী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। একই বছরের নভেম্বরে, আন্দোলনটি সিদ্দাপান তালুকের নিদগোদে পৌঁছেছিল এবং এতে তিন শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেছিল। অবশেষে, আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া কতদূর যুক্তি সম্মত, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে সরকারি তরফে এই আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।

নর্মদা বাঁচা ও আন্দোলন (Narmada Bachao Andolan):

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে যে পরিবেশ আন্দোলনটি ভারতে উদ্‌ভুত হয়, তা হল 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন'। ভারত সরকার নর্মদা নদীর উপত্যকা অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের দিকে নজর দেয়। সেই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় "নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প" (Narmada Valley Development Project- NVDP)। সেই অনুসারে নর্মদা ও তার উপনদীর জলধারার ওপরে ৩০ টি বড় বাঁধ, ১৮৫টি মাঝারি ধরনের এবং ৩০০০ টি ছোট বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। মূল নর্মদা নদীর স্রোতধারার ওপরে ১০টি বড় বাঁধ নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয়, সবথেকে বড় বাঁধ হবে দুটি। একটি গুজরাতে "সর্দার সরোবর" নামে এবং অন্যটি হচ্ছে "নর্মদা সাগর"-মধ্যপ্রদেশ। নর্মদা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে খরা প্রবণ অনাবাদী জমিগুলিকে চাষযোগ্য করে তোলা হবে, ২৭০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ন করা হবে। 'সরদার সরোবর বাঁধ প্রকল্প' হচ্ছে এই সামগ্রিক কর্মসূচীরই অংশ। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়। বাবা আমতে, মেধা পাটকারের মতো বিশিষ্ট পরিবেশবাদীরা বলেন, নর্মদা প্রকল্প রূপায়িত হলে এই অঞ্চলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। মেধা পাটকর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে ও প্রকল্পটির নক্সা পর্যবেক্ষণ করে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, নর্মদা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১০০-র কাছাকাছি গ্রাম জলমগ্ন হবে সম্পূর্ণভাবে এবং প্রায় ৩০০-র কাছাকাছি গ্রাম আংশিকভাবে জলমগ্ন হবে। এছাড়া, সাড়ে তিনলক্ষ হেক্টর অরণ্য ভূমি বিনষ্ট হবে এবং প্রায় দশ লক্ষের মতো মানুষ উদ্বাস্তু হবেন। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ অরণ্য বৈচিত্র্য প্রায় অবলুপ্ত হবে। বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবনধারনের উপায় হারাবেন।

গুজরাট রাজ্যের ভারুচ জেলায় "সর্দার সরোবর" বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এই বাঁধটি সমুদ্রের সবথেকে কাছে এবং সবথেকে বড়ো। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম খাল নির্মাণ। বলা হয় যে, এর পরিণামে অসংখ্য মানুষ জীবিকা হারাবেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হবেন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মৎস্যজীবীরা। বাঁধের পশ্চাদবর্তী জলাধার প্রায় ২৫০টি গ্রামকে ভাসিয়ে দেবে। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জমি, বাড়ি এবং অরণ্যাঞ্চলের বিরাট অংশ জলমগ্ন হয়ে যাবে। পরিবেশ ও বনদপ্তরের সমীক্ষাভিত্তিক হিসাব অনুসারে, সর্দার সরোবর প্রকল্পের কারণে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮,১৯০ কোটি টাকা । নর্মদা সাগর প্রকল্পের জন্যে অরণ্য ধ্বংসের কারণে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩১,০০০ কোটি টাকার মত। ১৯৭৯ সালে 'নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পটি' প্রথম সরকারি অনুমোদন লাভ করে। এই প্রকল্পের জন্যে বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) ৪৫ কোটি ডলার মঞ্জুর করে ১৯৮৫

সালে। মহারাষ্ট্রের বাস্তুহারা জনগোষ্ঠী ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠনের উদ্দেশ্যে 'নর্মদা ধারাংগ্রস্ত সমিতি' গড়ে তোলেন। ১৯৮৭ সালে মধ্যপ্রদেশে গান্ধীবাদী নেতাদের সম্মেলনে গঠিত হয় "নর্মদা ঘাট নবনির্মাণ সমিতি "। কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর নর্মদা প্রকল্পকে অনুমোদন করলে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ছোট ছোট প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। অনেকগুলি গণ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মেধা পাটকারের নেতৃত্বে একটি বৃহৎ আন্দোলনের রূপ নেয়, যা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (Narmada Bachao Andolan) নামে পরিচিতি লাভ করে।

ব্যাপক বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলনের চাপে বিশ্ব ব্যাঙ্ক একটি স্বাধীন "রিভিউ কমিশন" (Review Commission) গঠন করে। প্রকল্পটির ভালো ও ক্ষতিকারক দিকগুলি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই কমিশনকে। কমিশন ১৯৯২ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে তার প্রতিবেদন পেশ করে। ১৯৯৩ সালের ৩১শে মার্চ বিশ্বব্যাঙ্ক নর্মদা প্রকল্পে ঋণদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। পুলিশী পীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে ও আন্দোলনকারীরা সত্যাগ্রহ, রাস্তা অবরোধ, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার কাছে বারবার আবেদন জানানো - এইসব অ-হিংস পদ্ধতির মাধ্যমে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। মেধা পাটকর ভারতীয় পরিবেশবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন। এত প্রতিরোধ সত্ত্বেও ভারত সরকার নর্মদা প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখে। নর্মদা উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের ফলে ১৯৯৩ সালে কয়েকটি মানুষের বসতবাড়ি জলমগ্ন হয়। প্রতিবাদী গণ-আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। দেশের পরিবেশবিদরা এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে থাকেন। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মহেশ্বর, বর্মী প্রভৃতি বাঁধেও তীব্র আকার নেয় প্রতিবাদী গণ-আন্দোলন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে ভারত-সরকার পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একটি "রিভিউ প্যানেল তৈরি করে। ১৯৯৭ সালে সরকার সর্দার সরোবর প্রকল্পের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলে যে, এই প্রকল্পের কাজ তিন বছর বন্ধ থাকবে। তাছাড়া, আশ্বাস দেওয়া হয় যে, নর্মদা নদীর ওপরে বাঁধ নির্মাণের প্রতিটি প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করা হবে। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, বাঁধের উচ্চতা নিচু করা যাবে না এবং উচ্ছেদ হওয়া গ্রামীণ পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দিতে হবে।

নবদান্য আন্দোলন (Navdanya Movement)

নবদান্য আন্দোলন একটি ভারতীয় পরিবেশবাদী ও সামাজিক আন্দোলন, যা জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জৈব চাষ এবং বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও পরিবেশ রক্ষার উপর জোর দেয়, যার নেতৃত্ব দেন বন্দনা শিবা। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলি হল- ১) জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ২) জৈব চাষ ও টেকসই কৃষিপদ্ধতির প্রচার করা। ৩) বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ৪) কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ থেকে বীজ রক্ষার জন্য কাজ করা। নবদন্যার মূল লক্ষ্য হল বীজ সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী জাতের বীজ বিনিময়ে সাহায্য করা। এটি ভারতে এবং বাইরের মানুষের সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত ভরণ-পোষণ বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। নবদন্যের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য স্থানীয় কৃষকদের সহায়তা করা, বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া ফসল ও গাছপালা কে উদ্ধার করা এবং সংরক্ষণ করা এবং সরাসরি বিপণনের মাধ্যমে বিপন্ন ফসলগুলিকে উপলব্ধ করা। নবদন্য আদিবাসী জ্ঞান ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এটি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছে ।

নবদান্য আন্দোলন মূলত জীববৈচিত্র্য, জৈব চাষ এবং বীজের কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কৃষকদের অধিকারকে প্রচার করে। নবদান্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্পষ্টভাষী সদস্যাদের মধ্যে একজন হলে বন্দনা শিবা, একজন পরিবেশ কর্মী, পদার্থবিদ এবং লেখিকা । নবদান্য ১৯৮৪ সালে রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোলজি (RFSTE) এর একটি প্রোগ্রাম হিসাবে শুরু হয়েছিল; যা পরিবেশবাদী বন্দনা শিবা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এটি একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা উদ্যোগ, পরিবেশগত সক্রিয়তাকে দিক নির্দেশনা এবং সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে ১৯৯১ সালে নবদন্যের সৃষ্টি হয়, যা জীবন্ত সম্পদের বৈচিত্র্য এবং অখণ্ডতা রক্ষা, বিশেষ করে দেশীয় বীজ, জৈব চাষ এবং ন্যায্য বাণিজ্যের প্রচারের জন্য একটি জাতীয় আন্দোলন। নবদান্য, যার অর্থ "নয়টি বীজ" বা "নতুন উপহার", হল RFSTE-এর একটি উদ্যোগ, যা কৃষকদের এককেন্দ্রিক খাদ্য উৎপাদকদের কাছ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করার পরিবর্তে বৈচিত্র্যময় এবং স্বতন্ত্র ফসল বজায় রাখার সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষিত করে। এই উদ্যোগটি ভারত জুড়ে ৪০টিরও বেশি বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে বৈচিত্র্যময় কৃষির জন্য আঞ্চলিক সুযোগ প্রদান করে এবং কুড়ি বছরের অস্তিত্বে ২০০০ এর বেশি বিভিন্ন জাতের ধান সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০০৪ সালে বন্দনা শিবা

যুক্তরাজ্যের শুমাখার কলেজের সহযোগিতায় উত্তরাখণ্ডের দুন ভ্যালিতে টেকসই জীবনযাপনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্লাচিমাদায় কোকো-কোলা বিরোধী সংগ্রাম (Anti Coca-Cola Struggle in Plachimada)

৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে হিন্দুস্তান কোকাকোলা বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড (HCBPL) প্লাচিমাদায় একটি বোতলজাত প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতির জন্য পেরুমট্টি পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করে । ২৭ শে জানুয়ারী, ২০০০ সালে পঞ্চায়েত কোকা-কোলাকে কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করে। এই স্থানটি ছিল ভালো ধান চাষের এলাকা, যেখানে চাষের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের প্রয়োজন ছিল। কোম্পানিটি এই এলাকাটি বেছে নিয়েছে। KSSP-এর দেওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কোকা-কোলা কাছাকাছি সেচ বাঁধ থেকে জল ব্যবহার করেছিল। বোরওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল শোষণের ফলে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য জলের উৎসের অভাব দেখা দেয়। প্ল্যান্টের বর্জ্য জল থেকে রাসায়নিকগুলি ভূগর্ভস্থ জলকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। জলের সংকটের কারণে পার্শ্ববর্তী শতশত একর ধানের জমিতে নিয়মিত কৃষিকাজে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। লোনা জলের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়া লোকজন বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার অভিযোগ করেন। চর্মরোগ এবং পেটের ব্যাধি প্রায়শই রিপোর্ট করা হয়েছিল। প্ল্যান্টের আশেপাশের লোকেরাও বায়ুদূষণের শিকার হয়েছিল। পরিবেশ দূষণের এই সমস্যাগুলি মানুষকে আন্দোলনের জন্য প্ররোচিত করেছিল, যা ২০০২ সালে আদিবাসী মহিলাদের দ্বারা কারখানার সামনে অবরোধ হিসাবে শুরু হয়েছিল। মানুষ প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে কোকা-কোলা বিরুদ্ধ জানকেয়া সমরা সমিতি গঠন করে। মানুশি, একটি মহিলা কল্যাণ সমবায়, পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিবার্টিজ (PUCL), KSSP এবং অয়ঙ্কলি পাদা, একটি নকশালপন্থী গোষ্ঠী আন্দোলনের শক্তিশালী সমর্থক ছিল এবং পরে রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়। বন্দনা শিবের নেতৃত্বে নবদন্য আন্দোলন এই কোকা-কোলা বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। শেষ পর্যন্ত পেরুমাটটি পঞ্চায়েত ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকল্পটির লাইসেন্স প্রত্যাহার করে নেয়।

অন্যান্য পরিবেশ আন্দোলন (Others Environment Movements)

ঝাড়খণ্ডের কোঠারি গ্রামের এক আদিবাসী মহিলা বনকর্মী সূর্যমণি ভাগ্য বনসম্পদ রক্ষায় আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। একজোট হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ঝাড়খণ্ড বন বাঁচাও আন্দোলনের পুরোধা সূর্যমণি ১৫ জন উপজাতীয় মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্যোগে ব্যয়বহুল সেগুন গাছ লাগানোর পরিকল্পনার বিরোধিতা করা। কারণ, এই উদ্যোগ বননির্ভর সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হত না। আসমুদ্রহিমাচলে নারীরাই জয়জয়কার-তার প্রমাণ কিন্তুরী দেবী। হিমাচল প্রদেশে পাহাড়ে অবৈধ খনিতে খননকার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই কিন্তুরী দেবী। খননের কাজ পাহাড়কে নষ্ট করে, ধানখেত ধবংস করে এবং জল সরবরাহ ব্যাহত করে। খননকার্যে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে তিনি লড়াই করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তুরী দেবী এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমর্থনে ৪৮ জন খনি মালিকের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। আদালত তাঁর মামলা শুনতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত তিনি ১৯ দিনের জন্য অনশন পর্যন্ত করেছিলেন। সেই অনশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৮৭ সালে খনির উপর স্থগিতাদেশ আরোপ করা হয়। পাশাপাশি পাহাড়ে ব্লাস্টিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার আদেশও দেয় হাইকোর্ট।

উপসংহার (Conclusion) :

প্রাচীনকাল থেকেই পরিবেশ সুরক্ষায় নারীর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। নারীরা সর্বদা আশেপাশের প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। তাঁরা পরিবারের সম্পদের ব্যবস্থাপক এবং প্রকৃতি থেকে সরাসরি পরিবারের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করেন। যেমন জল জ্বালানি কাঠ এবং বেশ কিছু জিনিসপত্র ইত্যাদি। নারীরা সেই সময় থেকে পরিবেশ রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন। নারীরা পুরুষদের তুলনায় পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয়। কারণ, পরিবেশের সাথে সবচেয়ে বেশি সংযুক্তভাবে গৃহস্থালী ও সামাজিক কাজ করেন। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীরা বিভিন্ন আন্দোলন করে পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করেছেন। হরতাল, বিক্ষোভ প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনে নিজেদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছেন। বিষ্ণোই আন্দোলন, চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, নবদান্য আন্দোলন, কোকো-কোলাবিরোধী সংগ্রাম প্রভৃতি পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে নারীরা অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। এইসব আন্দোলনে তাঁরা নিজেদেরকে গভীরভাবে যুক্ত করেছেন। পরিবেশ আন্দোলনে অমৃতা দেবী, মেধা পাটেকর, কিংকরি দেবী, বন্দনা শিবা এবং অসংখ্য নারীরা নেতৃত্ব দান করে এবং নিজেদেরকে যুক্ত করে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁদের সঙ্গে পরিবেশের নাড়ীর গভীর যোগ রয়েছে এবং পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য তাঁরা ভীষণভাবে আন্তরিক। বিভিন্ন পরিবেশবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীরা পরিবেশগত

সমস্যাগুলি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন এবং লিঙ্গ ও পরিবেশগত ন্যায়বিচারের বিষয়ে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে অবহিত করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে। তাই জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, যদি সমাজের অন্যান্য অংশ হাতে হাত ধরে নারীদের পাশে এসে দাঁড়ায়, তা হলে পরিবেশবাদী আন্দোলন তথা যে কোনো উন্নয়নধর্মী আন্দোলন অবশ্যই খুবই ফলপ্রসু হবে।

তথ্য সূত্র :

১. Das, Ujjal, Role of Women in Environmental Protection, 2022, IJPSG, ISSN-2664-6021, P-127.
২. Joshi, Vidyut and Upadhya, Rushiraj, Soicial Movements of India (2022), Rawat Publications, Jaipur, P-199.
৩. Mallick, Krishna, Environmental Movements of India (2021), Amsterdam University Press, P-88.
৪. Menon, Krishna and Subberwal, Soical Movements in Contemporary India (2019), Sage Publications India Private Limited, New Delhi, P 120.
৫. Perundevi, B., Environment Movements in India - A Historical Perspective, PETIR, May, 2019, ISSN-2349-5162, P 387-388.
৬. Sreenivasulu, M., Progressive Women Environmentalist and Green movements of India, IJNTI, March, 2024, ISSN-2984-908X, P a-45.
৭. Shah, Ghanashyam, Social Movements in India (2024), Rawat Publications, Jaipur, P 255-256.
৮. Thomas, Dr Sumi Meri, Role of Women in Environmental Conservation Movements in Kerala, IJRTI, 2022, ISSN-2456-3315, P-2066.
৯. চট্টোপাধ্যায়, ড. অনীশ, পরিবেশ (২০২১), টি.ডি. পাবলিকেশন্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা নম্বর-৩১৭-৩১৮.
১০. বসু, সজল, (সম্পাদক) ভারতের সামাজিক আন্দোলন (২০১৬), বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা নম্বর- ৪৫-৪৬.
১১. মহাপাত্র, অনাদি কুমার, ভারতের সামাজিক আন্দোলন (২০২২), সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা নম্বর- ২৮৭-২৮৮.
১২. সরদার, শ্যামল, পরিবেশ বিদ্যা (২০২২-২০২৩), অক্সিজোন বুকস, কলকাতা, পৃষ্ঠা নম্বর- ৪৭৩-৪৭৪.
১৩. ভট্টাচার্য, পৃথা, পরিবেশ বিদ্যা (২০১৯), কল্যাণী পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা নম্বর ২৪, ১৭৫-১৭৭.